Social Science Journal, No. 21, 2017, University of Rajshahi, Bangladesh, ISSN 1728-1474

বাংলাদেশের লোকাচার 'হুদুম দেও'-এর নিরিখে সাংস্কৃতিক বহু উৎপত্তিবাদ

ড. রওশন জাহিদ, পিএইচ ডি *

সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশের কৃষিজীবি সম্প্রদায় সাধারণত তাদের ঐতিহ্যিক জ্ঞান দ্বারা নিজেদের কৃষিভিত্তিক নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলি পূরণ করে থাকে। অন্যান্য সমস্যার মতো অনাবৃষ্টি ফসল উৎপাদনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য থেকে কৃষককে অনেক সময় বঞ্চিত করে। তাই তারা পূর্বপুরুষলব্ধ ঐতিহ্যিক আচার পালনের মাধ্যমে বৃষ্টির দেবতাকে খুশি করে ফসল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পানির চাহিদা পূরণের স্বপ্ন দেখে। বিশ্বাস করে যে, আচার পালনের ফলাফল তাদের প্রাত্যহিক জীবনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করবে। শুধু বাংলাদেশ নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও কৃষিজীবি সমাজ-সংস্কৃতির ভিন্নতা সত্ত্বেও প্রায় কাছাকাছি উপায়ে বৃষ্টির দেবতার খুশিকল্পে নানান আচার পালন করে থাকে। বাংলাদেশে এই ধরনের আচার 'হুদুম দেও' নামে প্রচলিত হলেও অন্যান্য দেশে ভিন্ন নামে প্রচলিত। তবে সভ্যতার ধারাপাতে মানুষ তার প্রয়োজনের নিরিখে নানান আচার পালনের রীতি-পদ্ধতি তৈরি করেছে যা সংস্কৃতির বহু উৎপত্তিবাদ তত্ত্ব দ্বারা প্রমাণিত; এটি লোকাচার 'হুদুম দেও'র সাহায্যেও বোঝা যায়। বর্তমান গবেষণার ফলাফল বাংলাদেশের লোকাচার 'হুদুম দেও'-এর নিরিখে সাংস্কৃতিক বহু উৎপত্তিবাদ তত্ত্বের প্রামাণিকতা নিশ্চিত করে।

Abstract

The agrarian community of Bangladesh usually fulfills their everyday agrarian needs using traditional knowledge. Like other constraints, sometimes drought deprives the farmers to acquire their expectations of agricultural production. To overcome this situation they try to please God through observing traditional rituals in securing adequate rainfall required for crop production. They believe that the observance of this rituals impact on their daily life positively. Not only in Bangladesh but also in other countries of the world, the agrarian communities though they have cultural diversities practice different rituals to please God of rain. Such ritual is called '*hudum deo' in* Bangladesh though it is called differently in other countries. In the history of civilization, men practice different rituals for meeting their needs which is supported by cultural polygenesis theory and it is understood through the observance of '*hudum deo*'. The findings of this research attest the cultural polygenesis theory in the context of Bangladesh ritual '*hudum deo*'.

ভূমিকা

মানবসভ্যতার আদিকাল থেকেই মানুষ তার চারপাশ নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে। অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণভার আপন হাতে রেখে জীবন ধারণের বাধা বিপত্তিগুলিকে দূর করতে চেয়েছে। সভ্যতার আদিলগ্নে মানুষ প্রকৃতি পূজক ছিল, ছিল সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী। তারা প্রকৃতিজাত সবকিছুতেই প্রাণ আরোপ করত ও তার সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে পূজার্চনা করত। সভ্যতার বিকাশের এক পর্যায়ে মানুষ কাজের সুবিধার্থে প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করল। উত্তরোত্তর প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ভয়াল রূপ

*সহযোগী অধ্যাপক, ফোকলোর বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ৬২০৫

তে মানবসভ্যতাকে রক্ষা করা সম্ভব হলো অনেকটাই। কিন্তু প্রযুক্তির প্রায়োগিক দিকের সুফল সীমাবদ্ধ রয়েছে নাগরিক জীবনের ঘেরাটোপে। নগর জীবনের বাইরে যাদের বাস তারা আজও প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। নির্ভরশীলতার পর্যায় আদিম স্তর থেকে উন্নততর হলেও প্রকৃতিপূজা কিংবা প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রশমনের জন্য দেব-দেবীর কল্পনা আজও অব্যাহত। শুধু কল্পনা নয়, এসব দেব-দেবীর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে পূজাচার করা হয় তাও গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, এক. বাংলাদেশের লোকাচার 'হুদুম দেও'-এর স্বরূপ নির্ণয়; দুই. সাংস্কৃতিক বহু উৎপত্তিবাদ তত্ত্বের নিরিখে লোকাচার বিশ্লেষণ; তিন. বাংলাদেশের লোকাচার উপজীব্য করে সাংস্কৃতিক বহু উৎপত্তিবাদ ধারণা প্রমাণ করা।

গবেষণা এলাকা

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করেন। যাঁরা গ্রামে বাস করেন তাঁদের অধিকাংশই কোনো না কোনোভাবে লৌকিক আচার-আচরণের সঙ্গে জড়িত। অনেক লোকাচার আবার পালিত হয় উৎসবের আকারে। তবে লোকাচারেরও আঞ্চলিকতা রয়েছে। ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় কিন্তু প্রয়োজন, এমন অবস্থায় মানুষ দেবতার শরণ নিয়েছে। খরাপ্রবণ এলাকার মানুষ দেবতার সাহায্য চায় বৃষ্টির জন্য এবং কিছু লোকাচারও পালন করে।

বর্তমান প্রবন্ধের জন্য বৃষ্টি সংক্রান্ত লোকাচার 'হুদুম দেও' সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার বীরজোয়ান ও দাদরইল গ্রাম, পোরশা উপজেলার পোরশা ও আমদা গ্রাম এবং লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার হোসনাবাদ ও রহমতপুর, হাতিবান্ধা উপজেলার নওদাবাস ও ফকিরপাড়া গ্রাম থেকে। উল্লেখ্য, বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের হিসাব অনুযায়ী উপর্যুক্ত এলাকাগুলিতে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বৃষ্টিপাতের হার কম।

উপাত্তের উৎস

এই গবেষণা সম্পাদনের ক্ষেত্রে গুণগত ও পরিমাণগত উপাত্তের ব্যবহার করা হয়েছে। মূখ্য ও গৌণ উভয় উৎস হতে উপাত্ত আহরণ করা হয়েছে। গবেষণার আধেয় বিষয় 'হুদুম দেও' লোকাচার সম্পর্কে অবহিত ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়েছে। বৃষ্টি আবাহনমূলক লোকাচার সম্পর্কে ধারণা আছে এমন উত্তরদাতা নির্বাচিত হন মোট ১২০ জন (সারণী ১)। মোট উত্তরদাতা গবেষণা গ্রামভিত্তিক ধারণা নিম্নরূপ:

সারণী ১: গবেষণা গ্রামভিত্তিক উত্তরদাতা বিন্যাস

জেলা	উপজেলা	গ্রাম	উত্তরদাতা বিন্যাস		'হুদুম দেও' লোকাচার অবহিত উত্তরদাতা বিন্যাস	
			n	%	n	%
নওগাঁ	নিয়ামতপুর	দাদরইল	১৫	১২.৫	২	১.৬৭
		বীরজোয়ান	১৫	১২.৫	৬	৫.০০
	পোরশা	পোরশা	১৫	১২.৫	৪	৩.৩৪
		আমদা	১৫	১২.৫	১১	৯.১৬
লালমনিরহাট	পাটগ্রাম	হোসনাবাদ	১৫	১২.৫	৭	৫.৮৩
		রহমতপুর	১৫	১২.৫	৮	৬.৬৭
	হাতিবান্ধা	নওদাবাস	১৫	১২.৫	২	১.৬৭
		ফকিরপাড়া	১৫	১২.৫	৫	৪.১৬
মোট			**১২০**	**১০০**	**৪৫**	**৩৭.৫০**

বৃষ্টির আবাহনমূলক লোকাচার সম্পর্কে জানেন এমন ১২০ জনের মধ্যে ৪৫ (৩৭.৫০%) জনের 'হুদুম দেও' লোকাচার সম্পর্কে ধারণা আছে (সারণী ১)। গ্রামভিত্তিক বিন্যাস ও পার্থক্য আলোচনা প্রয়োজন

'হুদুম দেও' লোকাচার অবহিত উত্তরদাতাদের ৪৫ জনের মধ্যে ২১ (৪৬.৬৭%) জনের প্রকাশযোগ্যতা আছে; তারা উদ্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে বলতে পারেন আর বাকি ২৪ (৫৩.৩৩%) জন কোনো কথাই বলতে পারেন না (সারণী ২)।

সারণী ২: 'হুদুম দেও' লোকাচার অবহিত উত্তরদাতার প্রকাশযোগ্যতা

প্রকাশযোগ্যতা	অবহিত উত্তরদাতা =৪৫	
	n	%
উদ্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে বলতে পারেন	২১	৪৬.৬৭
উদ্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে বলতে পারেন না	২৪	৫৩.৩৩

'হুদুম দেও' লোকাচার সম্পর্কে প্রকাশযোগ্যতাসম্পন্ন অবহিত উত্তরদাতাদের মধ্যে শুনেছেন এবং বলতে পারেন ৩ (১৪.২৯%) জন, আর ১ (০৪.৭৬%) জন লোকাচারটি পালিত হতে দেখেছেন এবং বলতে পারেন, কিন্তু শুনেছেন অথচ বলতে পারেন না এমন উত্তরদাতা ১৭ (৮০.৯৫%) জন (সারণী ৩)।

সারণী ৩: প্রকাশযোগ্যতাসম্পন্ন অবহিত উত্তরদাতা প্রকাশভঙ্গির ধরন

প্রকাশভঙ্গির ধরন	প্রকাশযোগ্যতাসম্পন্ন অবহিত উত্তরদাতা =২১	
	n	%
উদ্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে শুনেছেন এবং বলতে পারেন	০৩	১৪.২৯
উদ্দিষ্ট লোকাচারটি পালিত হতে দেখেছেন এবং বলতে পারেন	০১	০৪.৭৬
উদ্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে শুনেছেন কিন্তু বলতে পারেন না	১৭	৮০.৯৫

'হুদুম দেও' লোকাচার সম্পর্কে বলতে পারার যোগ্যতাসম্পন্ন অবহিত উত্তরদাতাদের মধ্যে হোসনাবাদ, রহমতপুর ও ফকিরপাড়ার ১ (০৪.৭৬%) জন করে উদ্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে শুনেছেন এবং বলতে পারেন। উদ্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে শুনেছেন কিন্তু বলতে পারেন না দাদরইল গ্রামের ৫ (২৩.৮১%) জন, বীরজোয়ান গ্রামের ৪ (১৯.০৫%) জন, পোরশা গ্রামের ২ (০৯.৫৩%) জন এবং আমদা গ্রামের ৬ (২৮.৫৭%) জন। আর উদ্দিষ্ট লোকাচারটি পালিত হতে দেখেছেন এবং বলতে পারেন নওদাবাস গ্রামের ১ (০৪.৭৬%) জন (সারণী ৪)।

সারণী ৪: **'হুদুম দেও' লোকাচার সম্পর্কে বলতে পারার যোগ্যতাসম্পন্ন অবহিত উত্তরদাতাদের জেলা, উপজেলা ও গ্রামভিত্তিক বিন্যাস**

জেলা	উপজেলা	গ্রাম	বলতে পারার যোগ্যতাসম্পন্ন অবহিত উত্তরদাতা =২১	
			n	%
নওগাঁ	নিয়ামতপুর	দাদরইল	০৫	২৩.৮১
		বীরজোয়ান	০৪	১৯.০৫
	পোরশা	পোরশা	০২	০৯.৫৩
		আমদা	০৬	২৮.৫৭
লালমনিরহাট	পাটগ্রাম	হোসনাবাদ	০১	০৪.৭৬
		রহমতপুর	০১	০৪.৭৬
	হাতিবান্ধা	নওদাবাস	০১	০৪.৭৬
		ফকিরপাড়া	০১	০৪.৭৬

তাত্ত্বিক কাঠামো

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানবসভ্যতা এক একটি স্তর অতিক্রম করেছে। দৈশিক ভিন্নতার জন্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি দায়ী। সভ্যতার স্তরগুলি অতিক্রমের ক্ষেত্রে মানুষ প্রায় একই ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে। কোনো কোনো গবেষকের ধারণা বিশ্বে প্রায় সকল স্থানে সংস্কৃতির বিকাশ প্রায় সমান্তরালভাবেই হয়েছে। এটিই সাংস্কৃতিক বহু উৎপত্তিবাদ তত্ত্ব হিসেবে পরিচিত। সাংস্কৃতিক বহু উৎপত্তিবাদ সম্পর্কে অ্যান্ড্রু ল্যাঙ দাবি করেছেন যে, "... given a similar state of taste and fancy, similar beliefs, similar circumstances, in a similar tale might concievably be independently evolved in regions remote from each other" (উদ্ধৃত, Thompson 1951: 381)। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কালে কালে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে পুষ্ট হয়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে নিজেদের সংস্কৃতির যে বিকাশ সংঘটিত হয়েছে তাতে বহিঃকাঠামোগত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হলেও অন্তঃকাঠামোগত সমরূপতা লক্ষণীয়।

'হুদুম দেও' পরিচিতি

অতিবৃষ্টির কারণে যেমন বন্যা হয়, ঠিক তেমনি অনাবৃষ্টির কারণে খরা। কৃষিপ্রধান এলাকায় বন্যা ও খরা উভয়ই ক্ষতিকর। তাই সাধারণ মানুষ অতিবৃষ্টিতে যেমন দেব-দেবীর শরণ নেয় তেমনি অনাবৃষ্টির ক্ষেত্রেও। অনাবৃষ্টি থেকে কৃষিকাজকে রক্ষার জন্য 'হুদুম দেও'র শরণ নেয়া হয়।

আভিধানিক বিচারে তৎসম শব্দ 'উদক' এর অপভ্রংশ হচ্ছে 'হুদুম'। তৎসম 'উদক' শব্দের অর্থ জল। 'দেবতা'র অপভ্রংশ হচ্ছে 'দেও'। অতএব 'হুদুম দেও' হলো জলের দেবতা। অন্যভাবে, 'উদুম' শব্দটি নগ্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই 'উদুম' শব্দটিতে 'হ' ধ্বনি যুক্ত হয়ে 'হুদুম' শব্দটি তৈরি হতে পারে। এই বিবেচনায় 'হুদুম দেও' অর্থ নগ্ন দেবতা। কিন্তু 'হুদুম দেও' শব্দ দু'টি যেভাবেই তৈরি হোক ব্যবহারিক অর্থে 'জলের দেবতা' বোঝায়। 'হুদমা', 'হুদুমচুকা', 'হুদুমা' প্রভৃতি নামেও এই দেবতা পরিচিত।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে ষড়ঋতুর বিভাজন থাকলেও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আবহাওয়ার ঋতুকালীন আচরণ সকল সময় একইরকম থাকে না। তাই শীতকালে কালবৈশাখী, চৈত্র মাসে পাহাড়ি ঢল, মাঘ মাসে

অতিবৃষ্টি ও আষাঢ় মাসে অনাবৃষ্টি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় অনাবৃষ্টির হাত থেকে নিজেদের জীবন জীবিকার প্রধান অবলম্বন কৃষিকে রক্ষার্থে গ্রামবাসী সাধারণ কৃষিজীবীরা ও তাদের উদ্বিগ্ন গৃহবধূরা বৃষ্টির দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করে।

বৃষ্টির দেবতার উদ্দেশ্যে পূজার্চনা করলে অনেক দিন ধরে অনাবৃষ্টির কারণে যে খরা হয় তা নিবারিত হয় বলে কৃষিজীবী সমাজ বিশ্বাস করে। কৃষি সমাজের নারী-পুরুষ সকলে এই বিশ্বাস পোষণ করলেও পূজার আচার পালনের ক্ষেত্রে অধিকাংশ কর্মযজ্ঞ নারীর অর্চনা। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে পুরুষও এতে অংশগ্রহণ করে থাকে। মানসিকভাবে এই আচার-উৎসবকে কৃষিজীবী সমাজের পুরুষরা সমর্থন করে এবং আচার পালনার্থে যে সকল ট্যাবু মানা অবশ্যকর্তব্য, তা-ও মেনে চলে।

'হুদুম দেও' পালনের সময়

পৌষ থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত বৃষ্টি না হলে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে খরার প্রকোপ দেখা যায়। তাই সাধারণত চৈত্র মাস থেকে আষাঢ় মাস–এই সময়েই 'হুদুম দেও' আচার পালিত হয়ে থাকে। দীর্ঘদিনের অনাবৃষ্টি, কাঠ-ফাটা রোদ আর প্রচণ্ড দাবদাহে জীবকুলের প্রাণ যখন প্রায় ওষ্ঠাগত, তখন কৃষক সমাজের রমণীকুল রক্ষামাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বৃষ্টির দেবতা বরুণ দেব যিনি 'হুদুম দেও' নামেও পরিচিত তার উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদিত হয়। দেবতার সন্তুষ্টিলাভকল্পে আয়োজিত 'হুদুম দেও' উৎসবে সাধারণত অর্ঘ্য হিসাবে উপস্থাপিত হয় নাচ-গান। এই নাচ-গানের মাধ্যমেই রমণীকুল বরুণ দেবের নিকট বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করেন।

পালনের পদ্ধতি

অনাবৃষ্টি চলতে থাকলে কৃষিজীবী সমাজের কয়েকটি পরিবারের নারীরা প্রথমে 'হুদুম দেও' উৎসব আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরে ঐ গ্রামের সকল নারীকে সিদ্ধান্তটি জানানো হয়। গোপন সভার মাধ্যমে অমাবস্যা তিথির কোনো এক রাতে এই আয়োজনের উদ্যোগ নেয়া হয়। নির্ধারিত রাতের নির্দিষ্ট সময়ে গ্রাম সংলগ্ন চাষের ক্ষেতে সমবেত হয় তারা। সাধারণত যারা অল্প বয়সী বা সন্তান ধারণ করেনি তারাই সমবেত দলের অধিকাংশ। বাড়ির রমণীদের অনুরোধক্রমে পুরো গ্রাম থেকেই তিন বৎসরাধিক বয়সী পুরুষ গ্রাম ত্যাগ করে থাকে। অসুস্থ ও বৃদ্ধদের ঘরে আটকিয়ে রাখা হয়। যে-কোনো ধরনের আলোক প্রজ্জ্বলন নিষিদ্ধ বলে পুরো গ্রাম জুড়েই রমণীদের অবাধ বিচরণ চলতে থাকে। চাষের ক্ষেতে সমবেত রমণীরা তাদের পরিধেয় সকল বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করে গ্রাম প্রদক্ষিণের প্রস্তুতি নেয়। তারা এমনভাবে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় যেন তাদের ডানপাশ গ্রামের পূর্বদিকে থাকে। সারিবদ্ধভাবে নেচে গেয়ে তারা গ্রামের সর্বপূর্বে অবস্থিত বাড়িটিতে প্রথমে প্রবেশ করে। গীত গানটি এমন (নিজস্ব সংগ্রহ):

হিল হিলাছে কমরটা মোর
শির শিরাছে গাও।
কোন্‌ঠে কেনা গেলা এলা
হুদমার দেখা পাও॥
পাটনিখান পড়ছে খসিয়া
হুদমা দেও দেখা আসিয়া।
আইসক রে হুদমা দেওয়া
তোর পথে মুই আছ বসিয়া ॥
ডিংসল্ সল্ কমরটা
তাতে নাই মোর ভাতারটা।

কি কর মুই কায়তা কয়
কোন্‌ঠে গেলে দেখা হয়
দেখা হলে দেহটা জুড়ায় ॥

ঐ বাড়িতে অবস্থানরত নারীরা আলো নিভিয়ে পূর্ব থেকেই আগমনকারী দলের অপেক্ষায় থাকে। প্রস্তুতি হিসাবে হাতের কাছে রাখে কয়েক কলস জল। নৃত্য-গীতরত সমবেত দলটি বাড়িতে আসামাত্রই তাদের শরীরে কলসের জল ঢেলে দেয়। ফলে বাড়ির উঠানে যে কর্দমাক্ত অবস্থার সৃষ্টি হয় তাতে সবাই পিছলা খেতে খেতে নাচতে থাকে। গানের শব্দগুলিতে যেমন কামনার বাষ্পীভবন থাকে, তেমনি নাচের মুদ্রায় প্রতীকায়িত হয় যৌনক্রীড়া। খুব বেশি সময় তারা এক বাড়িতে থাকে না, আবার সব বাড়িতে একই গানও গায় না। সমবেত দল ও আগত বাড়ির রমণী সকলেই পরের বাড়িতে যায় এবং একইভাবে জল নিক্ষেপের ফলে সৃষ্ট কাদা মেখে নাচ-গান করতে থাকে। আরেকটি গান হলো (নিজস্ব সংগ্রহ):

হুদুম দেওরে হুদুম দেও
হাগি আসিছি পানি দেও
হামার দ্যাশত নাই পানি
হাগা টিকায় বানাবানি।
হুদুম দেওরে হুদুম দেও
তোমার দ্যাশত নাই পানি
হাগি কর বানাবানি
হামার দ্যাশত নাই পানি।
হুদুম দেওরে দেও
হুদুম দেওর সাত ভাই
কারো প্যাটত পানি নাই
এক ভাইয়র আছে পানি
তাক ধরি টানাটানি।

আরেকটি গানের উল্লেখ পাওয়া যায় মুহম্মদ আবদুল জলিল রচিত 'উত্তরবঙ্গের লোকসংগীত' বইতে (জলিল ২০০১: ৫৯-৬০):

আয়রে দেওয়া গর্জি
ধান চাল থাক ভিজি
আয়রে দেওয়া শো শেয়া
মাং নিয়া থাক ভাসেরা
আয়রে দেওয়া ডাকিয়া
ধান চাল যাক ভাসিয়া
আয়রে দেওয়া ডাকিয়া
দই চিড়া দেং মাখিয়া।

কাদা মেখে নাচ-গান করে পুরো গ্রাম প্রদক্ষিণ করতে প্রায় সারা রাত চলে যায়। ভোর হওয়ার ঠিক আগে গ্রামের পশ্চিম দিক থেকে তারা যে চাষের ক্ষেত দিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল সেখানে উপস্থিত হয়ে আপন পরিধেয় অঙ্গে ধারণ করে। তবে অনেক অঞ্চলে পূজাচারের ক্ষেত্রে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

'হুদুম দেও' লোকাচারে বৈবাহিক সম্পর্কের গুরুত্ব

বিবাহপ্রথার মাধ্যমে সভ্য সমাজে যৌনাচার রীতিবদ্ধ হয়। ফলে যৌন সম্পর্ক উপভোগের জন্য নর–নারীর বিবাহ হয়ে ওঠে বাধ্যতামূলক। মানব সমাজে বিবাহ প্রথা চালু হওয়ার পর নারীর যৌন স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে এক পুরুষে নির্দিষ্ট করা হয়েছে (হক ১৯৯৫: ৪১)। বৃষ্টির দেবতা বরুণ দেবের সঙ্গে কোনো একজন অবিবাহিতা নারীর বিবাহের ব্যবস্থা করলে ধরায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা অধিক হয় বলে জনসাধারণের বিশ্বাস। অর্থাৎ বিবাহের মাধ্যমে দাম্পত্য সম্পর্কের শুরু। দাম্পত্য সম্পর্কের ভেতর দিয়ে একজন নারীর মনোলোক ও ব্যক্তিসত্তার পরিচয়ও পরিস্ফুট হয় (চৌধুরী ২০০৮: ৫৫)। অনেক অঞ্চলে অবিবাহিতা একজন রমণীকে সবাই মিলে চ্যাংদোলা করে ধরে তার গায়ে পানি ঢেলে দেয়। আর বরুণ দেবের সঙ্গে বিবাহের অভিনয় করে থাকে (সিদ্দিকী ১৯৯৪: ২০৫):

সুন্দরীরে বাইর কর গো কয়জন ধরিয়া,
চাইর বেডি আইল কইন্যা কোলে লইয়া।
এক পাক দুই পাক আনিল ঘুরাইয়া,
তিন পাকে দিল ফুল দুই হস্ত মেলিয়া।
মেঘ আইয়্যরে আইর‍্যা কোণা দিয়া,
কইন্যার মা বইয়া রইছে কইন্যা কোলে লইয়া।
তিন পাক চার পাক আনিল ঘুরাইয়া,
জন্তি ফুলে দুই হস্ত দিলরে ভরিয়া।
চার পাক পাঁচ পাক আনিল ঘুরাইয়া,
কনক ফুলে দুই হস্ত দিলরে ভরিয়া।
ছয় পাক সাত পাক আনিল ঘুরাইয়া,
চাইর চোখে দুই মুখ গেলরে মিলিয়া।
মেঘ আইয়্যেরে আইর‍্যা কোণা দিয়া,
কইন্যার মা কান্দন করে কইন্যারে বিলাইয়া।

বাংলাদেশের আদিবাসী সমাজে 'হুদুম দেও' লোকাচার

রাজবংশী নৃগোষ্ঠীর রমণীরা কাদা বা গোবরের সাহায্যে বৃষ্টির দেবতা বরুণ দেবের নগ্নমূর্তি তৈরি করে। অমাবস্যার অন্ধকার রাতে তারা শস্যক্ষেতের মাঝখানে বরুণ দেবের মূর্তি স্থাপন করে। আবরণহীন রমণীরা সঙ্গে আনা কয়েক কলস জল ঢেলে দেবমূর্তির চারপাশ কর্দমাক্ত করে তোলে। তারপর সেখানে যৌন অঙ্গভঙ্গিসহ কামনাময় শব্দচয়িত গান গেয়ে কাদা ছোঁড়াছুড়ি করতে থাকে। রাতের শেষ প্রহরে অবশিষ্ট জলে সর্বাঙ্গ ধৌত করে পূর্বের কাপড় পরিধান করে খালি কলস নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে তারা। আদিবাসী কোচ জনগোষ্ঠীর রমণীরা চাষের ক্ষেতে কলাগাছের চারা রোপন করে তার গোড়ায় কয়েক কলস জল ঢেলে বস্ত্রহীন অবস্থায় কাদা মেখে গান গেয়ে নেচে রাত ভোর হওয়ার আগেই স্বাভাবিক পোশাকে বাড়ি ফিরে আসে। অন্যমতে, নগ্ন রমণীরা চাষের ক্ষেতের অল্প কিছু অংশে জল ঢেলে কাদা তৈরি করত। তারপর কাঁধে জোয়াল নিয়ে সেই কাদার মধ্যে কেউ গরু, কেউ কৃষকের ভূমিকায় অভিনয় করত। পূর্বদিকের আকাশে ভোরের আভা প্রকাশিত হওয়ার আগেই কাপড় পরিধান করে যে যার বাড়িতে ফিরে যায়। অনাবৃষ্টি দূর করার জন্য হুদুম

দেওকে প্রসন্ন করে আচার-নৃত্য পালনের প্রথাটি উত্তরবঙ্গের কোচ কৃষক রমণীদের মধ্যে চালু আছে (ভট্টাচার্য ১৯৬৫)।

কালা ম্যাঘোক পূজো মাও মুঁই
কালা কইতর দিয়া।
ধওলা ম্যাঘোক পূজো মাও মুঁই
ধুপ সেন্দুর দিয়া।
কি ম্যাঘোরাজ জমিনে বইষ্যো গিয়া।
তোমার নর লোক মরেছে ম্যাঘোরাজ
জর জল বুলিয়া
এক আড়া জল দে ম্যাঘোরাজ
পিরথিমী ছিটিয়া।
কি ম্যাঘোরাজ জমিনে বইষ্যো গিয়া। (আহমদ ২০১২: ১৭৫)।

বৃষ্টি কামনার লক্ষ্যে পালিত এই উৎসব অনেক প্রাচীন এবং কৃষিজীবী সমাজের সঙ্গে বৃষ্টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে পৃথিবীর অনেক দেশেই এই উৎসবের প্রচলন আছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 'হুদুম দেও' লোকাচার পালনের সমরূপতা

বরুণকুমার চক্রবর্তী বলেছেন (চক্রবর্তী ২০০৩) যে, ভারতের গুজরাটে বয়স্ক মহিলা এবং বালিকারা সারিবদ্ধভাবে বাড়ি বাড়ি যায় আর তাদের মাথায় থাকে কাঠের তক্তার উপর রাখা মাটির ঢিবি। এই মাটির ঢিবি আবার নানা শাক-সবজি দিয়ে সাজানো হয়। মহিলার দল যখন এগোতে থাকে তখন একদিকে তারা যেমন মুখে মেঘরাজকে আহবান জানায়, তেমনি অপরদিকে অন্যান্য মহিলারা তাদের গায়ে জল ঢেলে ভিজিয়ে দেয়। এর ফলে বৃষ্টি নামে বলে তাদের বিশ্বাস।

বুলগেরিয়ায় বৃষ্টি কামনার প্রচলিত লোকউৎসবে পালিত লোকাচার সম্বন্ধে জানা যায় যে, তারা বৃষ্টি আবাহনের জন্য 'প্রজাপতি নৃত্য' নামে এক ধরনের নৃত্য করত। এই নৃত্যে প্রজাপতির ভূমিকায় থাকত একজন অল্প বয়সী রমণী যার গায়ে কোনো আবরণ থাকত না। প্রজাপতি নারীর কোমরবন্ধনীতে কয়েকটি ব্যাঙ বেঁধে নেয়া হতো গাছের লতা দিয়ে, হাতে থাকত গাছের ডালপালা। প্রজাপতি রমণীর সারা শরীর সবুজ পাতা দ্বারা আচ্ছাদিত থাকত। প্রজাপতি রমণীকে অন্যান্য অল্প বয়সী রমণীরা সঙ্গ দিত এবং তারা পুরো গ্রাম জুড়ে নাচানাচি করত। প্রজাপতি রমণী সঙ্গী অন্য রমণীদের গাওয়া গানের তালে তালে নাচত। ঠিক এই সময় নৃত্যরতা প্রজাপতি রমণীর শরীরে অন্য একজন রমণী পানি ঢেলে দিত। ফলে প্রজাপতি রমণী ভিজে যেত ও তার চারপাশ কর্দমাক্ত হয়ে উঠত। কর্দমাক্ত স্থানে প্রজাপতি রমণী, তার সঙ্গী ও অন্যান্য রমণীরা কাদা ছোঁড়াছুড়ি করে আনন্দ করত।

সার্বিয়াতেও বৃষ্টি কামনায় একই রকম আচার পালিত হত। সেখানে লতাপাতার ডগার সাহায্যে শরীর আচ্ছাদিত করে একজন অল্প বয়সী রমণী তারই সমবয়সী সঙ্গিনীদের নিয়ে গ্রামের এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যেত নৃত্য সহযোগে। লতাপাতা আচ্ছাদিত এই রমণী স্থানীয়ভাবে 'দাদোলা' নামে পরিচিত। একবাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে গমনের সময় তারা যে নৃত্য করত তার আলাদা কৌশল ছিল। 'দাদোলা' রমণীর সঙ্গীনীরা 'দাদোলা'কে ঘিরে বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে নাচত ও এক ধরনের গান করত যা 'দাদোলা গান' নামে পরিচিত। বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ানোর সময় গৃহিণীরা 'দাদোলা'র মাথায় পানি ঢেলে দিত আর 'দাদোলা' ও তার সঙ্গিনীরা কাদাযুক্ত পিচ্ছিল মাটিতে লুটোপুটি খেয়ে নাচানাচি করত।

রোমানিয়ায় প্রচলিত আচারেও প্রায় একই রকম দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। অল্প বয়সী একজন বেদে নারী এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে। এই বেদে রমণী 'বাবারুদা' নামে পরিচিত। উৎসবের আচার পালনের সময় 'বাবারুদা' খুব ছোট এক ধরনের ঘাগরা পরে যা লতাপাতার ডগা দিয়ে তৈরি। সে তার সমবয়সী রমণীদের নিয়ে বৃষ্টির দেবতার উদ্দেশ্যে গান গাইতে থাকে। এই গানের মূল বিষয় হলো বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা। গান গাইতে গাইতে রমণীর দল যখন বাড়ি বাড়ি যায় তখন গ্রামবাসী তাদের গায়ে বালতি বালতি জল ঢেলে দেয়। কাদা ছোঁড়াছুড়ি করে তারা বৃষ্টির দেবতার উদ্দেশ্যে গান নিবেদন করে। দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার বান্টু জনগোষ্ঠীতেও এরকম আচার পালন করতে দেখা যায়। বান্টু রমণীরা খুব সংক্ষিপ্ত পোশাক পরে ঘাস ও লতাপাতার সাহায্যে নিজেদের আবৃত করে রাখত আচার পালনের দিনে। তারা কাদা ছুঁড়ে গান গাইত আর যৌন অঙ্গভঙ্গিসহ নাচানাচি করত। গ্রাম প্রদক্ষিণের সময় প্রতিটি বাড়ির কূপের নিকট জল দিয়ে কাদা তৈরি করত ও তা ঐ লোকদের গায়ে ছুঁড়ে দিত। শেষ পর্যায়ে তারা কূপের পানির সাহায্যে নিজেদের পরিষ্কার করে নিয়ে অন্য বাড়িতে যেত। নগ্ন স্ত্রীলোক কাঁধে জোয়াল চাপিয়ে নদীর পানিতে চাষ করার অভিনয় করে। এ সময় তাদের গলায় বৃষ্টির দেবতার স্তুতিমূলক গান শোনা যায়। আর্মেনিয়া ও ট্রান্সসিলভানিয়াতেও একই দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। রাশিয়ার কুরস্ক প্রদেশে বৃষ্টির প্রয়োজন হলে রমণীরা কোনো পথচারীকে হরণ করে তাকে নদী বা পুকুরের পানিতে নিক্ষেপ করে চুবিয়ে তোলে, আবার পানিতে ফেলে দেয়। পোল্যান্ড ও রাশিয়ায় বালিকা ও রমণীরা গ্রামের এক প্রান্তে ক্ষেতের ধারে চলে যেত অন্ধকার রাতে খরার সময়। তারা মাটিতে পানি ঢেলে কাদার মধ্যে নগ্ন নৃত্য করত।

'হুদুম দেও' লোকাচার ও ট্যাবু

বৃষ্টি কামনায় হুদুম দেও আচার পালনের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু ট্যাবু বা নিষেধাজ্ঞা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, আচার পালনকারী সদস্যগণকে অবশ্যই রমণী হতে হবে। তিন বছরের বেশি বয়সী শিশুপুত্র এমনকি অসুস্থ ও বৃদ্ধরাও এলাকায় থাকে না। দ্বিতীয়ত, আচার পালনের সময় হতে হবে অমাবস্যার অন্ধকার রাত এবং তৃতীয়ত, আচার পালনকালে কোনো প্রকারেই কোনোরকম আলোক প্রজ্জ্বলন করা যাবে না। কড়াকড়িভাবে ট্যাবু পালনের কারণ হলো কোনোরকমে এর অন্যথা হলে বৃষ্টি তো নয়ই; টানা কয়েক বছর ধরে তীব্র খরার সৃষ্টি হতে পারে যার ফলে দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে। এর বাস্তব কারণ নারীর নগ্নদেহ যেন পুরুষ দেখতে না পারে। তবে আদিম জনগোষ্ঠীতে নগ্নতা স্বাভাবিক; কৃষিজীবী সমাজের প্রথম দিকে হয়তো পুরুষদের এলাকা ত্যাগ করতে হতো না।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত বিধি-নিষেধ মান্য করা হলেও কোনো কোনো অঞ্চলে এর ব্যতিক্রমও হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে বরুণ দেবের নিকট বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করা হয় অন্যরকম আচার পালনের মাধ্যমে। যেমন, কাদা মাটির সাহায্যে বরুণ দেবের একটি নগ্ন মূর্তি তৈরি করা হয়। তারপর তাতে গোবর লেপনের মাধ্যমে পবিত্রকরণ করা হয়। বাড়ির উঠানের এক কোণে একটি কাঠের গুঁড়ি বা একখণ্ড পাথরের উপর এটি স্থাপন করা হয়। গোবর দ্বারা লেপন করা এই মৃৎপিণ্ডটি অর্থাৎ বরুণ দেবের সামনে চাল ও চাল দ্বারা তৈরি সেদ্ধ খাবার নৈবেদ্য হিসাবে দেয়া হয়। গ্রামের সাধারণ লোকজন যারা এই পূজায় অংশগ্রহণ করে তারা সকলেই নৈবেদ্য গ্রহণ করে। সাধারণত বছরের শুষ্ক অর্থাৎ খরা মৌসুমেই এই পূজার আয়োজন করা হয়ে থাকে। গ্রামের সকল মানুষ যেমন এই পূজায় অংশগ্রহণ করে থাকে তেমনি যে-কোনো গ্রামবাসীই এই পূজার আয়োজকও হতে পারে।

'হুদুম দেও' লোকাচার ও বিশেষ প্রত্যয়

মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

'হুদুম দেও' লোকাচারে সুপ্ত যৌনচেতনা প্রকাশিত। বৃষ্টির দেবতার উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদিত হয়েছে যৌন আকুতিময় গানের সাহায্যে। গানের শব্দ চয়িত হয়েছে যৌন চেতনায় প্রভাবপুষ্ট শব্দাবলি থেকে। নিবেদনের আকুতিময়তা দেবতাকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে নিবেদিত। এই কাকুতি-মিনতি অবশ্যই নারীর পক্ষ থেকে হতে হবে, কারণ দেবতাকে পুরুষ হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। যৌন সন্তুষ্টির ক্ষেত্রে বিপরীত লিঙ্গের প্রয়োজন বলে লোকজন বিশ্বাস করে থাকে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে যৌন মিলনের মাধ্যমে যৌন অতৃপ্তিতে-ভোগা বৃষ্টির দেবতার বীর্য পতন হলেই ধরায় বৃষ্টি হওয়া সম্ভব। লোকাচারটি প্রাচীন হলেও দেখা যায় এতে দেবতাকে মানুষের মতো জৈবিক কামনাময় বলে কল্পনা করা হয়েছে। গবেষকগণের ধারণা মধ্যযুগের মানুষেরা ভীতিময় চরিত্র থেকে আলাদা করে দেবতাদের কল্পনা করেছিল। যারই ফল দেবতার মানবিক মূর্তি। মঙ্গলকাব্যের ধারা বিশে- ষণ করলে উক্ত ধারণার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি মেলে। প্রতিটি মঙ্গলকাব্যেই দেবতার ধারণায় অধিষ্ঠিত চরিত্রগুলি মানবিক বোধ ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি সম্পন্ন। অর্থাৎ মানুষের যেন দুইটি ধারা, একপক্ষ কর্ণা করে আর অন্যপক্ষ কর্ণা গ্রহণ করে। সমাজ ভাবনার আলোকে পুরো বিষয়টি প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের মতো।

শ্রমবণ্টন

সমাজগঠনের ভূমিকেন্দ্রিক শ্রমবিভাজনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ভূমি মালিকের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় চলত সমাজের অন্য অংশের মানুষের জীবন। দলিত-পীড়িত শ্রেণীর মানুষ যারা অন্যের ইচ্ছায় দিনাতিপাত করত তাদের কাছে দেবতার প্রতিরূপ ছিল ভূমিমালিক গোষ্ঠী। অর্থাৎ এই লোকাচারটিতে মধ্যযুগের সামাজিক গঠনের ছাপ পাওয়া যায়।

মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা

লোকাচারটির মাধ্যমে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। ঐ সমাজে মাতা ছিলেন সমাজে সন্তানের পরিচয়দাত্রী। এমনকি সম্পদ ও ভূমির বিলি-বণ্টন ব্যবস্থাও ছিল মাতার অনুকূলে। খরার কবলে শস্যহানি হয়তো মাতৃকুলকেই বেশি ভাবিয়ে তুলত। তাই তারা নিজেরা বসে না থেকে প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাতের জন্য নিজেদের এই প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করেছে। ফলে যৌন নিবেদনের ক্ষেত্রে তারা দেবতাকে পুরুষ ভেবে অর্ঘ্য নিবেদন করেছে। আবার সমাজে প্রভাব থাকার কারণেই লোকাচারে পুরুষের অংশগ্রহণের ব্যাপারে বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। সামাজিক বিধিতে সমাজের সকল নারীর প্রতি সকল পুরুষের যৌন অধিকার ছিল না বলেই নির্ধারিত অধিকারভুক্ত নারীরা নিজেদেরকে অন্য পুরুষ হতে নিষেধাজ্ঞা আরোপের মাধ্যমে সুরক্ষিত করেছে। আদিম সমাজে গোষ্ঠীর সকল নারীর ওপর সকল পুরুষের অধিকার ছিল। বিবাহপ্রথার মাধ্যমে তার পরিবর্তন হয়।

উর্বরতাতন্ত্র

উর্বরতাতন্ত্রের (fertility cult) নিরিখে বিচার করলে দেখা যায়, এই লোকাচারের পুরোটাই উর্বরতার ধারণাগত। ভূমিতে শস্য ফলানোর নিমিত্তে তা কর্ষণ উপযোগী করতে হয়। কর্ষণের সময় ভূমি নরম না হলে তা শস্য উৎপাদন-উপযোগী হয় না। অর্থাৎ ভূমি নরম করার জন্য বৃষ্টির প্রয়োজন। কেবল অনাবৃষ্টির কারণে ভূমি আবাদের অনুপযোগী হয়ে পড়লে এই লোকাচারটি পালিত হয়ে থাকে। পানির সাহায্যে নরমকৃত জমি যেমন শস্য উৎপাদনের উপযোগী, তেমন নারীও সন্তান জন্মদানের মাধ্যমে বংশধারাকে জিইয়ে রাখে। শস্য উৎপাদন

ও সন্তানের জন্মদান উভয়ই জনন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই নারী (যারা ঋতুমতী অন্যরা কিন্তু নয়) নিজেকে বেছে নিয়েছে লোকাচারটির প্রধান উপাদান হিসাবে। গান ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে দেবতার প্রতি উষ্ণ যৌনমিলনের আহবান যৌনতার প্রতীকায়ন, যার সাহায্যে ভূমির শস্য উৎপাদন উপযোগিতা বোঝানো হয়েছে। সখীবেষ্টিত রমণীগণের বারিসিক্ত হওয়া অনুকৃতিমূলক জাদুক্রিয়া বলেও গবেষকগণের ধারণা। পানির সাহায্যে রমণী যেভাবে নিজেকে ভিজায় তারা ভূমির ক্ষেত্রেও তা কল্পনা করে। অর্থাৎ তারা কর্ষণের অনুপযুক্ত জমিতে যেভাবে পানি ছিটায়, সেভাবে বৃষ্টি হলে ভূমি শস্য উৎপাদনের উপযোগী হয়ে উঠবে।

পিতৃতান্ত্রিকতা

যৌন অনুকৃতি ও পুরুষতান্ত্রিকতার নিরিখে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুরুষই সমাজের প্রতিভূ, স্বাভাবিক কারণে পিতাই পরিবারের প্রধান। পরিবার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিবাহপ্রথার সামাজিকীকরণের মাধ্যমে নারীর উপর পুরুষ অধিক অধিকার আরোপের সুযোগ লাভ করেছে। যৌনেচ্ছা প্রয়োগও এই অধিকারের ভিতরেই। তাই যৌন অনুকৃতির প্রসঙ্গ এলেই নারীর স্বাধীনতা ও পুরুষের কর্তৃত্ববাদের কথা এসে যায়। নির্দিষ্ট নারীর উপর যৌন অধিকার আরোপ যদি বিবাহের মূল কথা হয়ে থাকে তাহলে নারীর যৌন অনুকৃতি অন্যরা উপভোগ করবে এমনটা পুরুষের মেনে নেয়ার কথা না। কিন্তু আমরা হুদুম দেও লোকাচারে এমনটা দেখে থাকি, যদিও এটি নারীর প্রত্যক্ষতায় সংঘটিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ কোনো রকমেই পুরুষ তার আধিকারিক শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখেন না, কারণ নারী ব্যতীত অন্য কেউ তা উপভোগ করে না। আবার ব্যাপারটি অন্যভাবেও দেখা যায়। কৃষির উপর নির্ভরশীল সমাজে শস্য উৎপাদনের পরিমাণ কমে যাওয়া বা শস্যহানি পারিবারিক অনটনের অন্যতম প্রধান কারণ। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ তাই নারীকে অধিক শস্য উৎপাদনের হাতিয়ার হিসাবে এই লোকাচারে ব্যবহার করেছে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে।

উপসংহার

দেখা যায়, সারা পৃথিবীর দেশে দেশে বৃষ্টির আবাহনমূলক লোকাচার প্রচলিত। প্রতিটি লোকাচারেই বৃষ্টির দেবতার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নানা আচার পালিত হয়েছে যাতে শারীরিক ক্রিয়ার সাথে মৌখিক উচ্চারণও আছে। অনাবৃষ্টির কারণে খরা এবং দেবতার সন্তুষ্টি বিধানের মাধ্যমে বৃষ্টি আনয়ন সাংস্কৃতিক বহু উৎপত্তিবাদ তত্ত্ব প্রমাণ করে। আরও প্রমাণ করে যে, দেশে দেশে যে লোকাচার পালিত হচ্ছে তাতে অন্তঃকাঠামোগত কোনো ভিন্নতা নেই। সাংস্কৃতিক ভিন্নতার কারণে লোকাচারের উপস্থাপন প্রক্রিয়ায় যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় তা বহিঃকাঠামোগত বিভিন্নতার প্রমাণ। এভাবে বাংলাদেশের লোকাচার 'হুদুম দেও'-এর নিরিখে সাংস্কৃতিক বহু উৎপত্তিবাদ তত্ত্বের প্রামাণিকতা নিশ্চিত হয়।

তথ্যসূত্র

আহমদ, ওয়াকিল
২০১২ *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*। ঢাকা: গতিধারা।
চক্রবর্তী, বরুণ কুমার
২০০৩ *লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি।
চৌধুরী, আবুল হাসান
২০০৮ *বাংলা লোকসঙ্গীতে নারী*। ঢাকা: বিজয় প্রকাশ।
জলিল, মুহম্মদ আবদুল
২০০১ *উত্তরবঙ্গের লোকসংগীত*। ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য ভবন।

ভট্টাচার্য, আশুতোষ
১৯৬৫ *বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য় খণ্ড*। কলিকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস।
সিদ্দিকী, আশরাফ
১৯৯৪ *লোক-সাহিত্য, প্রথম খণ্ড*। ঢাকা: মল্লিক ব্রাদার্স।
হক, মাহমুদ শামসুল
১৯৯৫ *নারীকোষ*। ঢাকা: তরফদার প্রকাশনী।
Thompson, Stith
1951 *The Folkltale*. New York: The Dryden Press.